নগর বিকাশে অর্থনীতি ও পেশাগত বৈচিত্র্যের প্রভাব : প্রসঙ্গ পূর্ববাংলা (১৯০৫-১৯৫৫)

The Impact of the Diversification of Economy and Professions in Urban Growth : East Bengal Context (1905-1955)

ড. রওশন আরা আফরোজ*

Abstract: There are differences between the urban and rural economies of a country or region. Occupational diversity is one of the characteristics of urban life. The economy of East Bengal was predominantly agricultural. Therefore, the influences of agriculture on the urban economy here is clear. In addition to jobs in various government and private offices, job opportunities in agriculture-based industries and commercial establishments play a role in driving the pace of the urban economy. The emergence of some large factories along with small and cottage industries makes the new province economically prosperous and attractive to the professional class. The development of transport and transportation system takes the economy another step forward in this regard. The expansion of the railway system led to the development of the transport system. As a result, new job opportunities are created. The centers of major economic activities build as urban centers. Thus, the economic and occupational diversity play a vital role in the urban development of East Bengal.

Keywords: Urban Development, East Bengal, Urban Economy, Professional Diversity & Economic Development.

নগর বিকাশে একটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে পূর্ব বাংলাও ব্যতিক্রম নয়। সাধারণভাবে অকৃষিভিত্তিক পেশা নগর অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। তা সত্ত্বেও কৃষি নির্ভর পূর্ব বাংলার শিল্প ও বাণিজ্যে কৃষির প্রভাব স্পষ্ট। নগরে নানামূখী জীবীকার সন্ধান পাওয়ার সুযোগ থাকায় অনেকেই নগরে এসে ভীড় করেন। শিক্ষিত জনগোষ্ঠী যেমন নগরের সরকারি-বেসরকারি নানা স্তরের চাকরির সুযোগ পেয়ে থাকেন তেমনি আধা শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত মানুষেরা কেরানি, শ্রমিক বা কেউ পরিচারিকার কাজ করে থাকেন। তাছাড়া রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার কেন্দ্রস্থল হওয়ায় নাগরিক সমাজের নিকট নগরই প্রধান

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আকর্ষনীয় স্থান। কারণ তারা উন্নততর সভ্য জীবনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে নগরকেই বিবেচনা করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে বিশ শতকের প্রথমার্ধে পূর্ববাংলার অর্থনীতি ও পেশাগত বৈচিত্র্য নগর বিকাশে কতটা প্রভাব ফেলেছিল সে সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

নগর বিকাশে অর্থনীতি ও পেশাগত বৈচিত্র্য বিষয়ে আলোচনার পূর্বে নগর সম্পর্কে ধারণা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে হয়। দ্যা নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রেনিকায় বলা হয়েছে যে, 'একটি নগর বা City হলো' a relatively permanent and highly organized centre of population of greater size or important than a town or village.[১] ল্যাটিন 'Civic' শব্দের অর্থ নগর আর ইংরেজি 'Civilization' শব্দের অর্থ সভ্যতা। অর্থাৎ নগরের সাথে সভ্যতা ওতোপ্রতোভাবে জড়িত এবং নগরের উৎপত্তিকে সভ্যতার সূচক হিসেবে ধরা হয়। নগরের আকার, আয়তন, জনঘনত্ব ছাড়াও অধিবাসীগণ হয় অকৃষিজীবী এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরিই তাদের জীবিকার মাধ্যম। আবার এনসাইক্লোপেডিয়া বিট্রেনিকায় বলা হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট এলাকায় মসজিদ, মন্দির, দূর্গ, রাজধানী, বাজার, কারখানা প্রভৃতির অবস্থান এবং তা পরিচালনার জন্য একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা দৃশ্যমান হলে তাকে নগর বলে।[২] নগর সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী আলোচনা রয়েছে। ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ, ভূগোল বিশারদ প্রত্যেকেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 'নগর' শব্দটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আধুনিক গবেষকগণ নগরের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদ Gordon Childe-র মতে, বিভিন্ন সৌধ, ঘনবসতিপূর্ণ বিস্তীর্ণ এলাকা, খাদ্য উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন শ্রেণি (শাসক, বণিক, কারিগর) এবং শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি নগর বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য।[৩] সুতরাং বলা যায় কোন স্থানের আয়তন, জনসংখ্যা, বৃত্তিমূলক বৈচিত্র্য ছাড়াও অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উন্নত জীবনমানের বহুবিধ প্রথার অস্তিত্বই নগর। অনেক অশিক্ষিত যুবক চাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে শহরে গমন করে। শহরে কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় গ্রামের বেকার যুবকেরা ঐসব শিল্পকারখানায় শ্রমিকের কাজ পায়। আবার কেউ কেউ জীবিকা গ্রহণের জন্য নাগরিক পরিচর্যা শিল্পকে (হোটেল, রেঁস্তোরা, লন্ড্রি, বেকারি, পরিবহন, সেলুন ইত্যাদি) পেশা হিসেবে বেছে নেয়। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সহায় সম্বলহীন বহু মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে বাধ্য হয়। নদী ভাঙনে যেসব মানুষের আবাদী জমি ও বসতভিটা বিলীন হয়ে যায় তারা জীবিকার সন্ধানে শহর অভিমূখে যাত্রা করে। এভাবে নগর কখনও কখনও নিঃস্ব ব্যক্তির অথবা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল হয়ে যায়। কারণ নগরে পেশাগত বৈচিত্র্য থাকায় মানুষ নগরকে জীবীকার্জনের জন্য শ্রেয়তর মনে করে। ইতঃপূর্বে নগর বিষয়ে বেশ কিছু গবেষণা সম্পন্ন হলেও উল্লেখিত সময়ে নগরের অর্থনীতি ও পেশাগত বৈচিত্র্য বিষয়ে একক কোন প্রবন্ধে আলোচনা হয়নি। প্রবন্ধে কৃষিনির্ভর পূর্ববাংলার শিল্প ও বাণিজ্যে কৃষির উপর নির্ভরতার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। সেই সাথে অন্যান্য পেশাজীবীদের পরিসংখ্যানগত ধারনাও উল্লেখ করা হয়েছে। যা নগর অর্থনীতির গতি সঞ্চারে এবং নগর বিকাশে ভূমিকা রাখে।

ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলার নগর অর্থনীতির প্রকৃতি

ব্রিটিশ আমলে মোগল আমলের কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। খারাপ আবহাওয়ায় কৃষকরা খাজনা দিতে ব্যর্থ হয়। দুর্ভিক্ষ এ ক্ষেত্রে ভারতীয় অর্থনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়। এসময় ভূমি-কর ছাড়াও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য- চিনি, তেল, লবণ প্রভৃতির উপর কর আরোপ করা হয়।

এভাবে বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। পূর্বে অভিজাত শ্রেণির লোকেরা জমির খাজনা থেকে অর্জিত আয়ের উপর নির্ভরশীল ছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকে এ ধরনের আয় কমে যায়। কৃষি পণ্যের উৎপাদন হার ক্রমেই কমে আসতে শুরু করে এবং অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনার প্রয়াস ক্রমশ হ্রাস পায়। এর ফলে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়।[৪] এসময় ভূমিহীন চাষি ও সর্বহারাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫] বাংলায় এর সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ–

সারণি-১: ১৯২১-১৯৩১ সালে সমগ্র বাংলায় ভূমির মালিকানা (প্রতি হাজারে)

মালিকানার ধরন	সাল		শতকরা হ্রাস-বৃদ্ধি
	১৯২১	১৯৩১	
ভূমি মালিক (অকৃষক) এবং কর আদায়কারী	৩৯০	৬৩৬	+৬২
নিজস্ব ভূমি চাষী ও বর্গাচাষী	৯,২৭৫	৬,০৪১	-৩৫
ভূমিহীন চাষী	১,৮০৫	২,৭১৯	+৫০

সূত্র: A. R. Desai, Social Background of Indian Nationalism, Bombay, 1987, p. 65.

ভূমিহীন চাষী ও সর্বহারাদের এক অংশ জীবীকার সন্ধানে এসে শহর-নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। কৃষি থেকে উৎখাত হয়ে এ শ্রমিক শ্রেণি শহরের শিল্প কারখানায় কাজ পায়।[৬] এছাড়া ভদ্রলোকগণ (শিক্ষিত পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তা শ্রেণি) শহরে থাকলেও তাঁদের ছিল গ্রামপ্রীতি। তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা ছিল কলকাতা থেকে বিকীর্ণ ও নগরভিত্তিক ইস্যু দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। তা সত্ত্বেও জমিদারি ও খাজনা আদায়ের স্বার্থ ধরে রাখতে তারা গভীরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। বুদ্ধিজীবী মহল এসময় উভয় সংকটের সম্মুখীন হন। কারণ তারা বসবাস করতেন শহরে, কিন্তু গ্রাম থেকে আসা আর্থিক সাহায্যের উপর তারা অধিক নির্ভরশীল ছিলেন।[৭] এভাবে সমগ্র ভারতের গ্রামীণ এলাকা এবং এর জনসাধারণ শহর বা নগর দ্বারা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়। এ রকম ৩ ধরনের প্রভাবের কথা নগর গবেষক M. S. A. Rao-উল্লেখ করেছেন।[৮] যখন গ্রামের নিকটে কোন শিল্প গড়ে উঠে তখন শিল্পায়নের ধরনের উপর ভূমি ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন: যদি চিনি শিল্পের নগর হয় তাহলে কৃষকরা অধিক আখ চাষে লিপ্ত হয়। আবার যদি লৌহ শিল্প কারখানা স্থাপিত হয় তাহলে সেখানে শ্রমিকশ্রেণি জীবিকার সন্ধানে কাজ করতে যায়। সেখানে অভিবাসীর সংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে যেখানে কৃষিভিত্তিক শিল্পের প্রসার হয় সেখানে তুলনামুলকভাবে কম অভিবাসিত হয়।

পূর্ব বাংলার নগরে পেশাগত বৈচিত্র্য

বিশ শতকের শুরুতে বাংলায় সামগ্রিকভাবে মুসলমানগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোতে তাদের সংখ্যা ছিল স্পষ্টভাবে বেশি। পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলোর জমির উর্বরতা বজায় থাকলেও বিশ শতকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়ায় কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়। ১৯৩০ সালের দিকে পূর্ববাংলা চাল আমদানি নির্ভর এলাকায় পরিণত হয়। খাজনা আদায়ের বিস্তৃত ও প্রায় অপরিবর্তনীয় কাঠামোর গুরুভার বহন করায় কৃষকদের মধ্যে এক শ্রেণির লোক (প্রধানত হিন্দু) উনিশ শতকের শেষ এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি অর্জন করে। এর ফলে সাধারণ কৃষকদের তুলনায় তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি

পায়; আর অন্যরা বর্গাদার বা বর্গাচাষি ও কৃষিশ্রমিকে পরিণত হয়।[৯] শিক্ষালাভ বা চাকরি পাওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষী অনেক ভদ্রলোক পরিবার কলকাতা বা মফস্বল শহরে বসতি স্থাপন করে। এভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে বিশ শতকে শহরে বসবাসরত অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের জীবনযাত্রার মান ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে তাদের অনেকেই জেলা শহরে বসবাস করতে থাকেন। এদের মধ্যে অনেকে মফস্বল শহরে জমিদার ও তালুকদার হিসেবে বসবাস করে এবং অনেকেই নতুন সুযোগের প্রত্যাশায় নগরে চলে যায়। যারা মফস্বল ত্যাগ করে নগরে চলে যায় তারা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অনুভব করে, খাজনা আদায়ের ক্রমাবনতি তাদের আয়ের উপর মারাত্মক আঘাত হানে। শহরের চাকরি তাদের ক্রমহ্রাসমান আয়ের দুর্দশা মোচনের একটি উপায় হিসেবে দেখা দেয়। কিন্তু এ ধরনের সুযোগ ছিল খুবই সীমিত এবং চাকরি পাওয়া ক্রমেই কষ্টকর হয়ে পড়ে। ভারতীয়দের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক সরকারি উচ্চস্তরের আকর্ষণীয় পদে নিয়োগের সুযোগ পায়; কেউ কেউ উচ্চতর পেশা ও ব্যবসায়ে নিয়োজিত হয়। কিন্তু শহরের জীবন ছিল প্রতিযোগিতাপূর্ণ। অধিকাংশ ভদ্রলোক পরিবারকে তাই প্রশাসনের নিম্ন পর্যায়ের কম বেতনের চাকরি, শিক্ষকতা ও প্রাইভেট ফার্মে ক্লার্ক হিসেবে কাজ করে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।[১০] বাংলা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে সমগ্র বাংলায় সরকারি চাকরিতে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়।[১১] এতে ১৯০৫-১৯৩৩ সালে সরকারি বিভাগগুলোতে কর্মরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক পেশাজীবীদের সংখ্যা নিম্নরূপে দেখা যায়:

সারণি-২: ১৯০৫-১৯৩৩ সালে সমগ্র বাংলায় বিভিন্ন সম্প্রদায় ভিত্তিক পেশাজীবী

পেশা	বাঙালি মুসলমান	বাঙালি হিন্দু	এ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও ব্রিটিশ	অন্যান্য
চিকিৎসা বিভাগ	২১	১৭৯	৪২	১১
কারা বিভাগ	-	৫	৭	৩
পুলিশ বিভাগ	২৪	৩৭	৭৫	৭
শিক্ষা বিভাগ	৫৪	১৫৫	৪৭	১৮
গণপূর্ত বিভাগ	৪	৭৭	৩৭	৬
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	১০	৮	-	১
বন বিভাগ	২	১৬	১৭	-
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক	১	৯	১২	১
বিবিধ বিভাগ	৪৪	৯৯	৮০	১১
আয়কর বিভাগ	১৭	৩৭	২	৪
শুল্ক বিভাগ	-	৮	৭	৩
মোট	১৭৭	৬৩০	৩২৬	৬৫

সূত্র: History of Services of Gazetted and Other Officers, Part. II, Calcutta, 1933, pp. 13-868.

উক্ত রিপোর্টে সমগ্র বাংলার বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা শহরে বিভিন্ন বিভাগে চাকরিজীবীদের নাম ও সংখ্যা পাওয়া গেলেও এদের মধ্যে কত জন পূর্ব বাংলার ছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না। জয়া চ্যাটার্জী বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এবং বেতন ও খাজনা থেকে প্রাপ্ত অর্থের মূল্যমান কমে যাওয়ায় শহরে শিক্ষিত সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি ক্রমেই ধসে পড়ে। এই অবনতির সময় শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনীতির পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রভাব বিস্তার করে। তাছাড়া ১৯২৯ সালের দিকে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার কারণে জমিদারি খাজনা আদায় ব্যাপকভাবে কমে আসে। অর্থকরী ফসল পাট (পূর্ব ও উত্তর বাংলার অনেক জেলায় উৎপাদিত হতো) এবং প্রধান খাদ্যদ্রব্য চালের দাম আকস্মিকভাবে কমে যাওয়ায় অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়।[১২]

ব্রিটিশ আমলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নগরের বিকাশ

উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতে রেলপথের সূচনা হলে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটে। উনিশ শতকের প্রথম তিন দশকে পূর্ব বাংলায় ৩টি প্রধান শিল্প পেশা ছিল। সবগুলোই কৃষি উপকরণ ও গৃহ নির্ভর। সুতা, সিল্ক উৎপাদন এবং নীল প্রক্রিয়াজাতকরণ। সুতা ও সিল্ক ছিল পুরাতন শিল্প। উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ-ত্রিশ বছর নীল গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৮২৪ সালে যখন বিশপ হেবার (Bishop Heber) কলকাতা থেকে ঢাকায় যান তখন তিনি বড় বড় নীল কারখানা ও সুতিবস্ত্র তৈরি করতে দেখেছিলেন। তিনি কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরেও গিয়েছিলেন।[১৩] ঢাকা নগরের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্প (মসলিন) ১৮ শতকের দিকে ধ্বংস হতে থাকে। তখন শহরের আয়তন ও জনসংখ্যাও হ্রাস পায়। ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ঢাকার জনসংখ্যা ৩ লাখ বলে ধারণা করলেও প্রথম জনশুমারি রিপোর্টে (১৮৭২) ৬৯,২১২ জন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর থেকে ঢাকা নগরের জনসংখ্যা ক্রমেই বেড়েছে। এ অবস্থার আরো উন্নতি ঘটে ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের পর নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ফলে ঢাকাকে আবার রাজধানীর মর্যাদা দেয়ার পর। এসময় নারায়ণগঞ্জ ঢাকার ভারী শিল্প এলাকা এবং তেজগাঁও ছিল সম্ভাবনাময় শিল্প এলাকা। ঢাকায় এসময় পাট ও কাপড় মিল, জুতা ও গ্লাস কারখানা গড়ে উঠে।[১৪] উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে রাজশাহীর পুরাতন সিল্ক কারখানাগুলো ম্লান বা অদৃশ্য হতে থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুলভ মূল্যে এখান থেকে নীল, রেশম, আফিম, চিনি ও কিছু স্থানীয় সুতিবস্ত্র সংগ্রহ করত। পূর্ববাংলার প্রবেশপথে কলকাতা ইতোমধ্যে উন্নত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত নদী বা সমুদ্র পথই ছিল প্রধান যাতায়াত মাধ্যম।[১৫] উনিশ শতকে পূর্ব বাংলায় রেশম শিল্পসহ পূর্বের শিল্পব্যবস্থা হারাতে থাকে এবং এ অঞ্চল কলকাতার কারখানায় শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র হয়ে যায়। অবশ্য সেসময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাটের তৈরি জিনিসপত্রের চাহিদা ছিল।[১৬]

এ শতকেই যন্ত্রের যুগ শুরু হয়। এসময় পর্যন্ত সকল দ্রব্য তৈরি ও একত্রিত করা হতো হাতে। বিপণীকেন্দ্রের মালিক ছিল অল্প এবং সাধারণত এর অবস্থান ছিল গৃহে। কর্মচারী ছিল কম এবং তারা মালিক ও কর্মচারীর মধ্যে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখত। শিল্পে নবজাগরণ এমন একটা যুগ যখন বারুদ, মুদ্রণযন্ত্র এবং বিভিন্ন উপকরণ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি ঘটে। ১৭৬৫ সালে জেমস ওয়াট (James Watt) যখন স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন তখন থেকে যন্ত্র শক্তি স্বাধীন হয়। মালিকরা তাদের দোকান বা কর্মশালায় এই শক্তি কাজে লাগায় এবং দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বাণিজ্যও সম্প্রসারিত হয়। গৃহ থেকে ভিন্ন স্থানে কারখানা বা বিপণীকেন্দ্র গড়ে উঠে, এটা মালিক ও কর্মচারীদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে। নগরজীবনের

প্রতিটি আরামদায়ক অনুষঙ্গ শিল্প উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার জন্য নিয়োজিত হয়। কারখানাগুলো রেলপথের সংযোগস্থলে গড়ে উঠে এবং বিপণিকেন্দ্র ছিল শহরের কেন্দ্রস্থলে। সাগর, লেক ও নদীতীরের বন্দরশহরে জাহাজ বোঝাই করে কয়লা ও আকরিক আসত। কারখানার সাথে রেলপথ ও জাহাজ পথের সংযোগ থাকত এবং এর ফলে নদী-সরোবর সন্নিহিত শহরাঞ্চল মূল শিল্প শহরে পরিণত হয়। ইংল্যান্ড, আমেরিকার শিল্প শহরগুলোও এভাবেই গড়ে উঠে।[১৭] এই চিত্রটি পরবর্তী উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে বাংলায় লক্ষ করা যায়।

সমগ্র উনিশ শতক ব্যাপী আধুনিক যন্ত্রশিল্পের মধ্যে পাট শিল্পের স্থান ছিল সর্বাগ্রে। অবশ্য কোম্পানির শাসনের প্রথম থেকেই পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাণিজ্য প্রাধান্য পায়। প্রায় ১৮৩০ সাল পর্যন্ত বাংলার হস্তচালিত তাঁতে তৈরি দ্রব্যের (দড়ি, চট ও ব্যাগ) একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের ডান্ডিতে আধুনিক পাট শিল্প গড়ে উঠলে বাংলার হস্তচালিত পাট শিল্প প্রায় ধ্বংস হতে থাকে। তখন বাংলা থেকে কাঁচা পাট ইংল্যান্ডে রপ্তানি শুরু হয়। বাংলায় পাট চাষ ক্রমেই বেড়ে যায়। ১৮৫৫ সালে জর্জ অকল্যান্ড কর্তৃক (কলকাতার সন্নিকটে রিশ্‌রা নামক স্থানে) প্রথম আধুনিক যন্ত্রভিত্তিক পাট শিল্প গড়ে উঠে। ইতোমধ্যে স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কার হলে যন্ত্রের প্রয়োজনে কয়লা খনির কাজের উন্নতি ঘটে। কয়লা সরবরাহের অনিশ্চয়তা দূর হওয়ায় পাট শিল্পের বিকাশ সহজ হয়।[১৮] ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আধুনিক পাট শিল্প কারখানা ছিল না। কিন্তু পাট উৎপাদনে ও রপ্তানিতে পূর্ববাংলা ছিল শীর্ষে। যার অধিকাংশই রপ্তানি হতো কলকাতায়। বঙ্গভঙ্গের পর চট্টগ্রাম, চাঁদপুর ও নারায়ণগঞ্জে পাটকল স্থাপনের সুপারিশ হলেও বিশেষজ্ঞরা অদক্ষ শ্রমিক, বাজার সুবিধা, কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা এবং প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের অভাবের কথা বলেন।[১৯] তবে পাট চাষে পূর্ববাংলায় কয়েকটি অঞ্চলের খ্যাতি ছিল। ১৯১০-১৪ সালে ১০% এর বেশি পাট চাষের জেলাগুলো ছিল– ময়মনসিংহ (২৮%), বগুড়া (২৫%), ত্রিপুরা (২৪%), পাবনা (২১%), ঢাকা (১৮%), রংপুর (১৭%), ফরিদপুর (১৬%), রাজশাহী (১১%) ও যশোহর (১০%)।[২০] পাট কাটা ও পাট বস্ত্র বয়ন শিল্প পূর্ব বাংলায় ছিল না। বেশ কিছু এলাকায় পাট প্রক্রিয়াজাতকরণের ব্যবস্থা ছিল।[২১] যথা:

সারণি-৩: পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ (Jute Process) অঞ্চল

জেলা	১৯১১	১৯২১
রাজশাহী	-	২
দিনাজপুর	-	৪
রংপুর	-	২৪
পাবনা	১৮	১৫
ঢাকা	৩০	২৮
ময়মনসিংহ	৩	৩৩
ফরিদপুর	৪	২০
ত্রিপুরা	২	১৩

সূত্র: Report on the Census of India, 1921, Vol. V, Part-I, p. 405.

বিশ শতকের বিশের দশকে বাংলার শহরগুলোর চরিত্র ছিল খুব বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিশ শতকের প্রথম দুটি দশকে পূর্ববাংলার প্রধান শহর ঢাকার লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এ

বৃদ্ধির মূলে ছিল প্রশাসনিক এবং পাট ব্যবসা। এর অনেক আগেই ঢাকা শহর পূর্বের (মুসলিম শাসনকালের) ব্যস্ত শিল্প নগরের মর্যাদা হারায়। তবে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলায় ছোট ছোট শহরের আধিক্য ছিল। এর কারণ ছিল পাট ব্যবসার প্রসার। উদাহরণস্বরূপ চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও ঝালকাঠির নাম উল্লেখযোগ্য। রংগলাল সেন জনশুমারি রিপোর্টের উল্লেখ করে বলেন, পূর্ববাংলার শহর বিকাশের মূলে ছিল দুটি কারণ। যথা: ১. পাট ব্যবসার বিস্তার, ২. নতুন প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন।[২২] সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, বিশ শতকের গোড়ার দিকে ৩৬টি (বর্তমান বাংলাদেশে) পাটকল ছিল। দেশভাগের আগে এর সংখ্যা হয় ১০৭টি। এর সংখ্যা প্রায় তিনগুণ, মূলধন তিনগুণ এবং শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে দুইগুণের বেশি। তবে শ্রমিকের বেতন সে তুলনায় বাড়েনি। পাটের ন্যায় কয়লাখনির সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। শিল্পের বিস্তার, রেলওয়ে ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও স্টীমারের জন্য কয়লার ব্যবহার বাড়তে থাকে। ১৯০৫ সালের ২৪৬টি খনি ১৯২৪-২৫ সালে ২৫০টিতে উন্নীত হয়। তবে ১৯৩৪-৩৫ সালে এ সংখ্যা ১৮৪টিতে নেমে যায়।[২৩] পাটের ন্যায় বাংলার কয়লা খনির মালিকানা ছিল বেশির ভাগ বিদেশিদের হাতে।

১৯১১ সালের জনশুমারির তথ্য অনুযায়ী শহরগুলোর উন্নয়নের তথ্য মেলে। ব্যবসা, শিল্পায়নের সাথে পরিচয় হওয়া এবং ইউরোপীয়দের পরিচালনায় কিছু নতুন, কিছু পুরাতন ও বর্ধনশীল শহরগুলোর দ্রুত উন্নয়ন ঘটতে থাকে। রেল শহর, শিল্প শহর ও বাণিজ্যিক শহর বৃদ্ধি পাওয়ায় শহর ও নগর ক্রমেই বাড়তে থাকে।[২৪] ১৯২১ সালের জনশুমারি রিপোর্টেও শহরগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণিকে বলা হয় মফস্বল শহর বা 'Sleepy Country Towns'- যেগুলোতে কোন সুসংবদ্ধ শিল্প কারখানা ছিল না, শুধুমাত্র স্থানীয় ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে সামান্য গুরুত্ব ছিল। কেননা এই শহরগুলো আশেপাশের গ্রামের জনগণের মধ্যে যারা হাতের কাছে তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেমন: লবণ, কাপড়, তেল প্রভৃতি পেতো না, তাদেরকে সেগুলো সরবরাহ করত। এই শ্রেণিভুক্ত শহরগুলোর মধ্যে রয়েছে মূলত জেলা ও মহকুমা সদরদপ্তর এবং পুরনো ঐতিহাসিক শহর ও অন্যান্য অগুরুত্বপূর্ণ শহর। অন্য শ্রেণিভুক্ত শহরগুলোর (শিল্প ও বাণিজ্যিক শহর) মধ্যে ছিল পৌর শহর, রেলওয়ে কেন্দ্র এবং পাট বাণিজ্যের বৃহৎ কেন্দ্র।[২৫] শিল্প ও বাণিজ্যিক শহরগুলোর মধ্যে পূর্ববাংলার সৈয়দপুর রেলকেন্দ্র; নারায়নগঞ্জ, মাদারীপুর ও চাঁদপুর পাট বাণিজ্যকেন্দ্র; ঝালকাঠি এবং বন্দর শহর চট্টগ্রাম ছিল গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিকেন্দ্র।[২৬] অবশ্য পূর্ববাংলায় মফস্বল শহর ছিল অনেক বেশি। উক্ত শুমারির তথ্যানুযায়ী ১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় এই দুধরনের শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ছিল নিম্নরূপ:

সারণি-৪: ১৯০১ সাল থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় শহরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি

শহরের ধরন	জনসংখ্যা			জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	
	১৯২১	১৯১১	১৯০১	১৯২১-১৯১১	১৯১১-১৯০১
মফস্বল শহর	১৩৮৬০	১৩৫৮৭	১৩০৩৪	+২.০	+৪.২
শিল্প ও বাণিজ্যিক শহর	৩০৮৬৪	২৮,৮৮৮	২২,১৯৯	+৬.৮	+৩০.০১

সূত্র: Report on the Census of India, 1921, Vol. V, Part-I, Para-82, p. 110.

তালিকায় দেখা যায় যে, মফস্বল শহরের তুলনায় শিল্প ও বাণিজ্যক শহরের প্রসার হয়েছে বেশি। এর বেশ কিছু কারণ ছিল। বিশ শতকের শিল্পের উন্নয়ন সময়কালকে নাফিস আহমেদ ৩ ভাগে ভাগ করেছেন। যথা- ১. ১ম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের সময় (১৯১৪-১৯১৯ পর্যন্ত), ২. বিভাগপূর্ব সময় (১৯৪৭ পর্যন্ত) এবং ৩. বর্তমান সময় (১৯৪৭ পরবর্তী)।[২৭] আবার সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের প্রথম দুই দশককে শিল্প জগতের স্বদেশী যুগ বলেছেন।[২৮] তখন তন্তুবয়ন শিল্পে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল খ্যাত ছিল। এর মধ্যে ঢাকা শহর ও মহকুমার গ্রামগুলো যথা- ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল, ত্রিপুরার ময়নামতি, নোয়াখালীর চৌমোহনী অন্যতম। তবে তন্তুবয়নকারীদের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না কারণ উৎপাদনের পূর্বেই তারা ধার করত। অর্থশোধ দিতে তাদের লভ্যাংশের সামান্যই থাকত। তাছাড়া ১৯০৮ সালে ৭৫% তন্তুবয়নকারী মহাজনদের উপর নির্ভর থাকত। অবশ্য এর পর ঢাকা, সিরাজগঞ্জে বয়ন কারখানা নির্মিত হয়। রাজশাহী ও বগুড়ায় ধুতি কাপড়, শার্ট ও কোর্টের কারখানা তৈরি হয়েছিল।[২৯] এছাড়া ১৯০৬ সালে ২৫০টি চা বাগান ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের শিল্পের অবস্থা একটি সারণির সাহায্যে দেখানো হলো:

সারণি-৫: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পূর্ববাংলার শিল্পের অবস্থা

শিল্পের ধরন	**শহর**
রেশম কারখানা	রাজশাহী (৩টি)।
তামাক কারখানা	রংপুর (১টি)।
তেল মিল	ঢাকা, দিনাজপুর, পার্বতীপুর, নলছিটি এবং ঝালকাঠি (৫টি)।
সুতার মিল	কুষ্টিয়া (১টি)।
Ginning কারখানা	চট্টগ্রাম (১টি)।
স্টীমার মেরামতের ওয়ার্কশপ	গোয়ালন্দ ও বরিশাল (২টি)।
রেলওয়ে কারখানা	ঢাকা, সৈয়দপুর এবং চট্টগ্রাম (৩টি)।
হোসিয়ারী কারখানা	পাবনা ও সিরাজগঞ্জ (২টি)।
রাইস মিল	রাজশাহী ও চট্টগ্রাম (৩টি)।

সূত্র: Nafis Ahmed, An Economic Geography of East Pakistan, 1968, pp. 219-222.

সৈয়দপুর এবং চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে মোট ৩টি রেলওয়ে কারখানায় মোট ৩,১৯৩ জন চাকরিরত ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সময়কালে ভারী শিল্প ছিল না। শিল্পের বিকাশও থেমে যায়। ১৯০৩ সালে ঢাকায় লৌহ কারখানা তৈরি হলেও বঙ্গভঙ্গের পরে পূর্ব বাংলায় লৌহ ও সীট তৈরির যাত্রা শুরু হয়। চা শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি, রেলওয়ের যন্ত্রপাতি, কৃষি যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন নির্মাণ কাজ এবং গৃহের যন্ত্রপাতি তৈরি শুরু হয়। যার ফলে চট্টগ্রামে একটি লৌহ কারখানা নির্মিত হয়। এছাড়া বাংলার চা ও পাটের ন্যায় চামড়াও ১৯০৪ সাল হতে পূর্ববাংলার অন্যতম রপ্তানিপণ্যে পরিণত হয়। শহরে যার বাজার ভাল ছিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনায় চামড়া বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল।[৩০] এসময় ঢাকার 'ট্যানারি ওয়ার্কস', পাবনার 'ট্যানিং কোং' অন্যতম চামড়া শিল্প ছিল।[৩১] এ শিল্প কারখানাগুলো দ্বারা চামড়াশিল্পের বহির্বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

১৯০৬ সালে সৃষ্ট স্বদেশী আন্দোলন এদেশে হস্ত ও কুটির শিল্পে প্রভাব ফেলে। ঢাকা জেলায় ১৯২৭ সালে 'ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্' সৃষ্টি হয়। এর পরই ১৯২৯ সালে নারায়ণগঞ্জে 'চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্', ১৯৩২ সালে 'লক্ষ্মী কটন মিলস্', ১৯৩৬ সালে 'বান্ধব সুগার (Bandhab Suger) এবং কটন মিলস্', ১৯৩৮ সালে 'ঢাকা কটন মিলস্' প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া ১৯৩৭ সালে ঢাকেশ্বরী তাদের ২য় কারখানা নির্মাণ করে।[৩২] অবশ্য ১৯০৬-১২ সালে স্বদেশী আন্দোলনকালে তাঁত শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। এর আগেই কয়েকটি তেলের কারখানা, সাবান কারখানা, বরফ কল ও বেভারিজ শিল্প গড়ে উঠেছিল।[৩৩] উনিশ শতকের প্রথম দশকে স্টীম শিল্প বা বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত জাহাজ প্রচলিত হওয়ার পর চট্টগ্রামে সরের জাহাজের প্রচলন কমতে থাকে। মনে করা হয় ১৯১৪ সালে 'আমিনা' নামক জাহাজটি চট্টগ্রামে নির্মিত সরের জাহাজের শেষ নিদর্শন।[৩৪] বাংলার শহরগুলো (১) শিল্পায়িত এবং (২) অশিল্পায়িত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অশিল্পায়িত শহরগুলো মূলত জেলা এবং মহকুমার প্রশাসনিক সদরদপ্তর হিসেবে ছিল। ১৯৩১ সালের জনশুমারি রিপোর্টে পূর্ব বাংলায় মোট ১২টি শিল্পায়িত শহর পাওয়া যায়।[৩৫] এ শহরগুলো ছিল:

সারণি-৬: পূর্ব বাংলার শিল্পায়িত শহর (১৯৩১)

শিল্পের ধরন	শহর
পাট সংগ্রহ ও পাট pressing (৫টি)	নারায়নগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর ও মাদারীপুর।
রেলওয়ে শিল্প (২টি)	সৈয়দপুর ও লালমনিরহাট।
জাহাজ শিল্প (৪টি)	বরিশাল, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ও ঝালকাঠি।
অন্যান্য শিল্প (১টি)	ঢাকা।

সূত্র: Report on the Census of India, 1931, Vol. V, Bengal and Sikkim, Part-I, Report, p. 78.

দেখা যায় এসময় ভারী শিল্প বলতে রেল ও জাহাজ শিল্পই ছিল অন্যতম। অন্যান্যগুলো ছিল ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প। ১৯২১ সালে বাংলায় মোট চা বাগান ছিল ৩৪০টি। যা ১৯১১ সালে ছিল ২৪০টি। এর মধ্যে পূর্ব বাংলার চট্টগ্রামে- ২২টি এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ১টি।[৩৬] ১৯২১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী এই চা বাগানগুলো যারা নিয়ন্ত্রণ করত তাদের একটি তালিকা দেয়া হলো–

সারণি-৭: ১৯২১ সালের চা বাগানগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী

নিয়ন্ত্রণকারী	১৯১১	১৯২১
কোম্পানির ইউরোপীয় পরিচালকগণ কর্তৃক পরিচালিত	১৫৮	১৮৪
কোম্পানির ভারতীয় পরিচালকগণ কর্তৃক পরিচালিত	১৮	৮২
কোম্পানির ইউরোপীয় Mixed Boards পরিচালিত	০০	১১
ইউরোপীয় মালিকানায়	৪৬	৩৬
ভারতীয় মালিকানায়	১৮	২৭

সূত্র: Report on the Census of India, 1921, Vol. V, Part-I, p. 389.

পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও নগরের বিকাশ

১৯২১ সালের পর পূর্ববাংলায় যন্ত্রনির্ভর বস্ত্র শিল্পের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলায় ৪৬টি কারখানায় ৪৫,৩৯৪ জন শ্রমিক কাজ করত। দেশভাগের পর পূর্ববাংলার ১০টি বস্ত্র কারখানার মধ্যে নারায়ণগঞ্জে ৩টি, ঢাকায় ৩টি, কুষ্টিয়ায় ১টি, খুলনায় ১টি এবং চট্টগ্রামে ছিল ১টি। ১৯৫১-৫২ সালে ১২টি বস্ত্র মিলের নারায়ণগঞ্জে ৪টি, ঢাকায় ৩টি, কুষ্টিয়ায় ২টি, খুলনায় ২টি, পাবনায় ১টি এবং চট্টগ্রামে ছিল ১টি। ১৯৫৩ সালেই এ শিল্পের সংখ্যা ১৫টি হয়ে যায় এবং নিবন্ধিত কারখানার শ্রমিক সংখ্যা হয় ১২,২১৮ জন।[৩৭] দেশভাগের পরে পূর্ববাংলার বস্ত্র শিল্প ও শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা তালিকার সাহায্যে দেখানো হলো:

সারণি-৮: দেশভাগের পরে বস্ত্রশিল্প ও শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা

সময়	শিল্পের সংখ্যা	শ্রমিকের সংখ্যা
১৯৪৭-১৯৪৮ সাল	১০টি	১০,০০০ জন
১৯৫১-১৯৫২ সাল	১২ টি	১০,৫০০ জন
১৯৫২-১৯৫৩ সাল	১৫ টি	১২,২১৮ জন

সূত্র: Nafis Ahmed, An Economic Geography of East Pakistan, 1968, pp. 239-240.

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানও তাদের তৈরি বস্ত্র পূর্ববাংলায় বিক্রির কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু পূর্ববাংলায় তাঁতের সংখ্যা চার লক্ষের উপরে রয়েছে এমন তথ্য ১৯৫০ সালের এক রিপোর্টে প্রকাশ পায়। তাই প্রয়োজনের খাতিরেই পাকিস্তান আমলে ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, কুষ্টিয়া, খুলনা ও চট্টগ্রামে বেশিরভাগ বস্ত্র কল স্থাপিত হয়। অন্যদিকে কে. কে. সেন ১৯৩৮ সালে হালিশহরে চট্টগ্রামের প্রথম বস্ত্রকল অর্থাৎ 'ন্যাশনাল কটন মিলস্' স্থাপন করেন। দেশভাগের পর ১৯৫৩ সালে এম. এম. ইস্পাহানী এবং ১৯৫৪ সালে এ. কে. খান পাহাড়তলীতে বস্ত্রকল স্থাপন করেন।[৩৮] ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলার ঢাকা ও চট্টগ্রাম দুটি নগরের জনসংখ্যা ১,০০,০০০ অতিক্রম করেছিল। এসময় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ শহরের জনসংখ্যা ছিল ৪,১১,২৭৯ (শহরতলিসহ)।[৩৯] অবশ্য ১৯৫১ সালের সরকারি রিপোর্টে পূর্ববাংলায় শিল্পশহরের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। এসময় শিল্পের সংখ্যাও বেড়ে যায়।[৪০] একটি তালিকার সাহায্যে দেখানো হলো:

সারণি-৯: পূর্ববাংলার শিল্পায়িত শহর (১৯৫১)

শিল্প	শহর
সাধারণ স্থাপত্য (General Engineering)	ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, লালমনিরহাট, সান্তাহার, পার্বতীপুর এবং কুষ্টিয়া।
Jute Pressing and bailing	নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, ময়মনসিংহ, মাদারীপুর, জামালপুর ও ভৈরব।
Jute Spinning and weaving	নারায়ণগঞ্জ।
Textile Weaving	নারায়ণগঞ্জ ও চট্টগ্রাম।
জাহাজ নির্মাণ	বরিশাল, চট্টগ্রাম ও ঝালকাঠি।
চা কারখানা	সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা।

সূত্র: Report on the Census of Pakistan, 1951, Vol. 3, Part-I, Karachi, p. 59.

নাফিস আহমেদ বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরবর্তী সময় পর্যন্ত পূর্ববাংলার শিল্পের অবস্থা এবং এ শতকের শিল্পের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে পূর্ববাংলায় ১৯১১ সালে শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২২টি, ১৯৪৭ সালে ২৫২টি এবং ১৯৫৫ সালে ৪৬২টি দেখানো হয়েছে। এই কারখানা শিল্পে ১৯৫৫ সালে ১,১০,৭০৬ জন লোক নিয়োজিত ছিল বলে উল্লেখ রয়েছে।[৪১] অর্থাৎ শিল্পে নিয়োজিত ছিল উল্লেখযোগ্য অংশ। ১৯৫১ সালের রিপোর্টে পূর্ব বাংলায় কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভর লোকের সংখ্যা নিম্নোক্তভাবে জানা যায়।[৪২] নিচে বিভাগভিত্তিক পরিসংখ্যান দেয়া হলো:

সারণি-১০: ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলার স্বনির্ভর লোকের সংখ্যা

বিভাগ	মোট জনসংখ্যা	বেসামরিক শ্রমশক্তি		অকৃষি পেশায় নিয়োজিত (%)
		কৃষি	অকৃষি	
পূর্ব বাংলা	৪,১৯,৩২,৩২৯	১,০৭,১৫,৪৬৭	২১,৭০,৮৭৩	৫.১৮
চট্টগ্রাম	১,১৭,২১,৭৭০	৩১,০৬,০৭৯	৬,৪৮,২৭২	৫.৫৩
ঢাকা	১,৬২,০৯,৪২২	৪১,৫৬,৪৭৪	৮,৮৮,৭৩১	৫.৪৮
রাজশাহী	১,৪০,০১,১৩৭	৩৪,৫২,৯১৪	৬,৩৩,৮৭০	৪.৫৩

সূত্র: Report on the Census of Pakistan, 1951, Vol. 3, East Bengal, Part-II (Tables), p. 11: 3.

উপরের তথ্য অনুযায়ী পূর্ববাংলার জনসংখ্যার সামান্য অংশই অকৃষি পেশায় নিয়োজিত ছিল। পূর্ব বাংলার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫.১৮ ভাগ ছিল অকৃষি পেশায় নিয়োজিত। নাফিস আহমেদ তাঁর গ্রন্থে অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে নগরগুলো ৬ ভাগে বিভক্ত করেছেন। পূর্ববাংলার আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এ বিভাগ যুক্তিযুক্ত ছিল। শহরসমূহ স্থানীয় বাজার, ব্যবসা, যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রতিবেশি গ্রাম এলাকার দ্রব্যাদির মাধ্যমে এর প্রয়োজন মেটে। তবে এখানে সবকিছুই হাতের কাছে থাকে না (প্রধান দ্রব্য ও জীবনের সব প্রয়োজনীয় জিনিস)। দেখা যায়, দেশের অনেক থানা ও মহকুমায় এ ধরনের শহর গড়ে উঠেছে। এ রকম শহর ছিল মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ), হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার (সিলেট), রাজবাড়ি (ফরিদপুর), কুড়িগ্রাম (রংপুর), পটুয়াখালী ও পিরোজপুর (বরিশাল), নওগাঁ (রাজশাহী) এবং সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট (খুলনা) অন্যতম। আবার পাট উৎপাদন সংলগ্ন এলাকায় পাট সংগ্রহকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু শহর গড়ে উঠেছিল ৬০-৭০ বছর ধরে। পাট ব্যবস্থাকে ঘিরে বন্টন ও বাজার সুবিধা বৃদ্ধি পায়। স্থলপথ ছাড়াও এখানে জলপথে পরিবহনের সুবিধা ছিল। এই ধরনের শহরের মধ্যে ভৈরব বাজার, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর, বাজিতপুর (ময়মনসিংহ); মুন্সিগঞ্জ ও নরসিংদী (ঢাকা); মাদারীপুর (ফরিদপুর); ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর (কুমিল্লা) এবং গাইবান্ধা, ডোমার ও ফুলছড়ি (রংপুর) ছিল অন্যতম। অর্থাৎ পূর্ববাংলার যে জেলাগুলো (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা ও রংপুর) সমগ্র বাংলায় পাট উৎপাদনে শীর্ষে ছিল সেখানে নগর গড়ে উঠেছে অধিক হারে।[৪৩] এ থেকে বোঝা যায় কৃষি অর্থনীতির সমৃদ্ধির উপর পূর্ববাংলার নগর বৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল।

ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে নগর বিকাশের তুলনামূলক আলোচনা

১৯৪৭ সালে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। এসময় এই প্রদেশ অভিজাত, উচ্চশ্রেণি ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত দ্বারা শাসিত হতে থাকে। বিদেশি শাসনের অবসানের ফলে এই সময়ে একটি নতুন মুসলিম রাষ্ট্র গড়ে তোলার উৎসাহ ও উদ্দীপনা অর্থনৈতিক অগ্রসরতা এবং সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করে। তাই পাকিস্তানের স্বল্পস্থায়ী প্রদেশ হিসেবে পূর্ব বাংলায় নগর বিকাশের ক্ষেত্রেও এক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেশভাগের সাথে সাথে ভারত থেকে অধিক সংখ্যক মুসলিম জনগণের অভিবাসনের ফলে পূর্ব বাংলার কোন কোন শহরে রাতারাতি জনসংখ্যা অবিশ্বাস্যভাবে বৃদ্ধি পায়, বিশেষ করে ঢাকা শহরে।[৪৪] কাজী আনওয়ারুল হকের উল্লেখ করে লিখেছেন:

> আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হওয়ায় স্বাধীনতার পর গ্রাম থেকে শহরে কাজের সন্ধানে আসা মানুষদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই সমস্যাটি আরো বেড়ে যায় কয়েক বছর ধরে ভারত থেকে শরণার্থী আসতে থাকে। পূর্ব-পাকিস্তানে আসা অধিকাংশ শরণার্থী ছিল শহরের বাসিন্দা। এরা হচ্ছে ব্যবসায়ী, দোকানদার, কারিগর, অর্ধ-দক্ষ কর্মী এবং সব ধরনের পেশাজীবী লোকজন। তাদের অনেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকার হয়ে বাড়িঘর হারিয়েছে।[৪৫]

একই সাথে প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকার উদ্ভব এবং চট্টগ্রাম শহরকে দেশের বৃহত্তম বন্দর হিসেবে গড়ে তোলার জন্য কাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধি ও নানা সুবিধাদি প্রদান, সরকারি বিনিয়োগ ও বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে দেশকে শিল্প ও বাণিজ্যিকভাবে উন্নত করা, মফস্বল শহরগুলোতে শিল্প এলাকা গড়ে তোলা এবং অনেক নতুন নতুন প্রশাসনিক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সবকিছু মিলে পূর্ববাংলার নগর বিকাশকে জোরদার করে তোলে।[৪৬] পূর্ব বাংলায় সরকারি বিনিয়োগ খুব কম হওয়ার ফলে এখানে শিল্পের উন্নয়ন ছিল ধীর গতির। ফলে এই প্রদেশ ক্রমাগত কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পূর্ববাংলার প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক এবং শিল্পখাতের উন্নয়ন তাই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে।[৪৭] পূর্ববাংলার অধিক ভূমির মালিক, গুরুত্বপূর্ণ পেশাজীবী ও উঁচু পর্যায়ের আমলাদের অনুপস্থিতিতে প্রথম থেকেই ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানে।[৪৮] Brinda Bose- উল্লেখ করেন যে, শিল্পবিপ্লবের প্রভাবে স্বাধীনতার পরে উপনিবেশিক ভারতীয় জনসংখ্যা শহরমুখী হয়, কারখানার উদ্ভব হয় এবং সেখানে কাজের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন থাকে।[৪৯] মূলত অর্থনীতির কাঠামোর উপর নগর ব্যবস্থার পরিবর্তন নির্ভর করে। এটা পেশাগত কাঠামো এবং উৎপাদনশীল কাঠামোর সামঞ্জস্য পরিবর্তন নির্দেশ করে।[৫০] তবে এর মানে এই নয় যে, শুধু অর্থনৈতিক কারণই নগর পরিবর্তনের মূল কারণ। পেশাগত কারণ ছাড়াও সামাজিক এবং ভৌগোলিক কারণও গুরুত্বপূর্ণ।

পূর্ববাংলায় নগর-শহরগুলো সৃষ্টি হয়েছে মূলত জেলা ও মহকুমার প্রশাসনিক সদরদপ্তর স্থাপন, পেশাগত শ্রেণির স্থায়ী বসতি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং এর সম্প্রসারণকে কেন্দ্র করে। এছাড়া কিছু শহর স্থানীয় শিল্পের গুরুত্বের কারণে বা বিকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে সম্পূর্ণ শিল্পনগর খুঁজে বের করা কঠিন। আধুনিক শিল্প বলতে যা ছিল তা হলো পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ মিল, সুতাকল, চিনিকল, চাল ও তেল মিল এবং রেলওয়ে ওয়ার্কশপ। খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, চাঁদপুর, সৈয়দপুর, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ শহরগুলো

এগুলোর মাধ্যমে বিকশিত হয়। সেতাবগঞ্জ (দিনাজপুর), দর্শনা (কুষ্টিয়া), নলছিটি (বরিশাল), চন্দ্রঘোনা (চট্টগ্রাম), ফেঞ্চুগঞ্জ ও ছাতক (সিলেট) ছোট শহর হিসেবে গড়ে উঠে। এগুলোর ভিত্তি ছিল চিনি, সিমেন্ট ও কাগজ শিল্প।[৫১] দেশভাগের পর রাজশাহী শহরের সাহেব বাজার গুরুত্ব লাভ করে। ১৯১১ সালে জেলার মোট জনসংখ্যার ৭৪,০০০ জন বা ৫% শিল্পে এবং মোট জনসংখ্যার ৬৪,০০০ জন বা ৪% ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ছিল। L. S. S. O'Malley তাঁর 'District Gazetteers of Rajshahi' (1916) তে মন্তব্য করেন,

> Nearly a fifth of those supported by industrial occupations earn their bread by rice pounding and husking, a domestic occupation followed by women. Silk Spinning and weaving once so important a factor in the economic life of the district, now supports only 3,000 people, of whom half are workers, while there are only 2,500 supported by cotton spinning and weaving, of whom 1,200 are workers.[৫২]

১৯৪৭ সাল অবধি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী' ভারতে প্রায় সবচেয়ে বড় গেঞ্জির কারখানা ছিল বলা যায়।[৫৩] ফরিদপুরও স্থানীয় হস্ত ও কুটির শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। L. S. S. O'Malley তাঁর 'Bengal District Gazetteers: Faridpur' (1925) এ বলেন,

> According to the Census of 1921 all together 1,61,000 persons or 7 per cent of the population are dependent on industries of different kinds for their livelihood. The great majority of the local industries are handicrafts or cottage industries.[৫৪]

বিশ শতকের প্রথম দশকে চট্টগ্রামের মোট জনসংখ্যার ৬০% ছিল কৃষিজীবী। পূর্ববাংলার অন্যান্য অংশে এই হার ছিল শতকরা ৭৬%। চট্টগ্রামে শিল্পে নিয়োজিত ছিল ১৪ ভাগ, বাণিজ্যে ১ ভাগ, অন্যান্য পেশায় ৪ ভাগ এবং ১২ ভাগ ছিল শ্রমিক শ্রেণি।[৫৫] চট্টগ্রামে চা শিল্প গড়ে উঠার ফলে জনগণ এ শিল্পে নিয়োজিত হতে থাকে। বাণিজ্যে এ শিল্পপণ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। ১৯০৫-০৬ সালের হিসেবে চট্টগ্রামে মোট চা বাগান ছিল ২৪টি। তবে বাংলার পাট, আখ, তুলা চাষ যতটা সফল ও অধিক উৎপাদন হয়েছে চা সে তুলনায় কমই হয়েছে।[৫৬] ১৯০৫-০৬ সালে বঙ্গভঙ্গ কালে চট্টগ্রাম বন্দরে মোট বাণিজ্যের পরিমাণ বেড়ে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ হয়। এর আর্থিক মূল্য ছিল ৪৬৩.৪১ লাখ। এই বছরে বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ৩১৭.৭৬ লাখ এবং উপকূলীয় বাণিজ্য ছিল ১৪৫.৬৪ লাখ। মোট বাণিজ্যের বৈদেশিক বাণিজ্য ৬৯% এবং উপকূলীয় বা ভারতীয় বাণিজ্য ৩১%। রেলপথের সম্প্রসারণ এই বন্দরের কর্মকাণ্ডে বিস্তার সাধন করে।[৫৭] চট্টগ্রাম বন্দরে ১৯০১-০২ সালে যে বৈদেশিক বাণিজ্য চলে ১৯০৫-০৬ সালে তা চারগুণ বৃদ্ধি পায়।[৫৮] তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পোড়ামাটি নীতির ফলে পূর্বাঞ্চলের সাম্পান এবং বড় বড় নৌকা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। এভাবে আরাকান থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়।[৫৯] ফলে এসময় বন্দরকেন্দ্রিক বাণিজ্যে ভাটা পড়ে।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় পূর্বেকার উৎপাদন ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ ও শহুরে অর্থনীতির মধ্যে জৈবিক সম্পর্ক ভেঙ্গে পড়ে। এর ফলে জন্ম হয় অনেক শহর ও নগরের, যার মূল অধিবাসী হলো অনুপস্থিত জমিদার, মহাজন, মুৎসুদ্দী, ব্যবসায়ী, উকিল, সরকারি কর্মচারী, কেরানি, শিক্ষক, ক্ষুদে ব্যবসায়ী ও ঠিকাদার।[৬০] ১৯০৮ সালের পর থেকে বাংলার পাটকল ও অন্যান্য

শিল্প প্রতিষ্ঠানে কৃষিনিরপেক্ষ বা কারখানার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হয়। তুলনামূলকভাবে শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকার কারণে গ্রামের গরিব ও মেহনতি মানুষ দলে দলে শহরে আসে। ফলে শহরাঞ্চলে লোকসংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। এদের বসবাসের জন্য বস্তি গড়ে উঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর সম্পদশালী হিন্দুদের বাস্তুত্যাগের কারণে শহরে উঠতি বাঙালি মুসলিম শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাবশালী অংশ শহুরে সম্পত্তি, ব্যবসা ও শিল্পের মালিক হয়।[৬১] এভাবে শহরে পেশাদারী ও ব্যবসায়ী শ্রেণির জন্ম হয়। দেখা যায় যে, উন্নত বিশ্বেও নগরের বিকাশ ঘটেছে বিশ শতকেই। যদিও উনিশ শতকে শিল্পের বিকাশ, যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় কর্মসংস্থানের সম্ভাব্য স্থানে জনসমাগম ঘটায় শহরও সেখানে বৃদ্ধি পায়। বাংলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বলা যায় উপনিবেশ হওয়ায় পাশ্চাত্যের নগরায়ণ পদ্ধতি এখানেও প্রতিফলিত হয়েছিল। তাছাড়া সময়টি এমন ছিল যে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব সারা পৃথিবীকেই প্রভাবিত করে। তাই আধুনিক নগরের বিকাশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি এবং পেশাগত বিভিন্নতা বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র ও টীকা :

১. *The New Encyclopedia Britannica*, 1975, Vol. II, p. 951.

২. *Encyclopedia Britannica*, Vol. V, 1973, p. 809.

৩. V. Gordon Childe, 'The Urban Revolution', Gergory L. Possehl (ed.), *Ancient cities of the Indus*, 1st Edition, Vikas Publishing House Pvt. Ltd., New Delhi, 1979, pp. 12-17.

৪. জয়া চ্যাটার্জী, *বাঙলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিভাগ (১৯৩২-১৯৪৭)*, অনুবাদ: আবু জাফর, তৃতীয় সংস্করণ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬।

৫. A. R. Desai, *Social Background of Indian Nationalism*, Reprint, Popular Prakashan, Bombay, 1987, p. 59.

৬. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (ঊনবিংশ শতাব্দী)*, প্রথম প্রকাশ, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৫২।

৭. জয়া চ্যাটার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ৮-৯।

৮. এ প্রভাবগুলো হলো– প্রথমত, গ্রামের বহু সংখ্যক মানুষ দূরবর্তী শহরে বা নগরে কাজের জন্য যায়। উচ্চ বর্ণের অভিবাসীরা গ্রামে এসে তাদের উপার্জিত অর্থ নির্মাণ কাজে ব্যয় করে। শহরে অভিবাসী চাকরিজীবীর সামাজিক মানদণ্ড গ্রামের পরিবার থেকে ভিন্নতর হয়ে থাকে। এভাবে শহরে একজন অভিবাসী চাকরিজীবী হয় এবং তার কাজের প্রকৃতি গ্রামের গৃহস্থের থেকে ভিন্নতর হয় যা অবস্থানগত পার্থক্য সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়িত শহরের নিকটে অবস্থিত কোন গ্রামে ঐ শিল্পায়িত শহরের প্রভাব পড়ে। যখন গ্রামের নিকটে কোন শিল্প নগরী উদিত হয় তখন গ্রামের সবাই সেখানে কোন না কোন ভাবে সংযুক্ত হয়। এখানে শিল্পায়নের ধরনের উপর ভূমি ব্যবহার হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, মেট্রোপলিটন নগরের আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি সমগ্র গ্রামাঞ্চলের উপরই প্রভাব ফেলে। কারণ নগরের সীমানা বিস্তৃত হওয়ায় শহরের উপকণ্ঠে থাকা গ্রাম গুলোকে শহরটি (মেট্রোপলিটন) গ্রাস করে ফেলে। দেখুন, M. S. A. Rao, *Urbanization and Social Changes: A Study of a Rural Community on a Metropolitan Fringe*, First Published, Orient Longmans Ltd., New Delhi, 1970, pp. 2-4.

৯. জয়া চ্যাটার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ.পৃ. ৬৭-৬৮।

১০. *ঐ*, পৃ.পৃ. ৭১-৭২।

১১. *History of Services of Gazetted and Other Officers*, Part. II, Calcutta, 1933, pp. 13-868.

১২. জয়া চ্যাটার্জী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩।

১৩. Bisop Heber, *Narrative of a Journey through the Upper Province of India*, London, 1828, Vol. I, p. 133; Cited in Nafis Ahmed, *An Economic Geography of East Pakistan*, Oxford University Press, London, 1968, p. 96.

১৪. *Report on the Census of Pakistan*, 1951, Vol. 3, East Bengal, Part-I, Report, p. 65.

১৫. Nafis Ahmed, *op. cit.*, p. 110.

১৬. *Ibid*, p. 216.

১৭. Arthur B. Gallion and Simon Eisners, *The Urban Pattern: City Planning and Design*, Second East-West Reprint, East-West Papers Pvt. Ltd., New Delhi, 1969, pp. 63-66.

১৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস (উনবিংশ শতাব্দী)*, পৃ. ৯৩।

১৯. Nafis Ahmed, *op. cit.*, p. 219.

২০. ড. ওয়াজেদ আলী, বাংলার *অর্থনৈতিক ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১১, পৃ.পৃ. ৮৪-৮৫।

২১. *Report on the Census of India*, 1921, Vol. V, Bengal, Part-I, Report, p. 405.

২২. ড. রংগলাল সেন, *বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস*, পুনর্মুদ্রণ, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬২।

২৩. *Report on the Census of India*, 1921, Vol. V, Bengal, Part-I, Report, p. 405.

২৪. *Report on the Census of India*, 1911, Vol. V, Part-I, p. 28.

২৫. *Report on the Census of India*, 1921, Vol. V, Bengal, Part-I, Report, Para-79, p. 109.

২৬. *Ibid*, Para-80, p. 109.

২৭. Nafis Ahmed, *op. cit.*, p. 217.

২৮. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, *বিংশ শতাব্দী (১৯০০-১৯৪৭)*, প্রথম প্রকাশ, কে পি বাগচী এ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ১১৭।

২৯. Nafis Ahmed, *op. cit.*, pp. 217-218.

৩০. *Ibid*, pp. 218-222.

৩১. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *বাংলার আর্থিক ইতিহাস*, *বিংশ শতাব্দী (১৯০০-১৯৪৭)*, পৃ. ১২১।

৩২. *East Pakistan District Gazetteers: Dacca*, 1969, p. 197.

৩৩. বি. এ. আজাদ ইসলামাবাদী সম্পাদিত, *চট্টগ্রাম স্মরণী*, প্রথম সংস্করণ, সাপ্তাহিক সমাজ পরিবেশনা, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭, পৃ. আরো কিছু তথ্য ও অন্যান্য: ১২।

৩৪. সৈয়দ আহমদুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

৩৫. *Report on the* Census of India, 1931, Vol. V, Bengal and Sikkim, Part-I, Report, p. 78.

৩৬ *Report on the Census of India*, 1921, Vol. V, Bengal, Part-I, Report, p. 389.

৩৭. Nafis Ahmed, *op. cit.*, pp. 239-240.

৩৮. সৈয়দ আহমদুল হক, *চট্টগ্রামের শিল্প ও বাণিজ্য*, প্রথম খণ্ড, চট্টগ্রাম, ১৩৯৫, পৃ.পৃ. ৩৮-৩৯।

৩৯. *Report on the Census of Pakistan*, 1951, Vol. 3, East Bengal, Part-I, Report, p. 64.

৪০. *Ibid*, p. 59.

৪১. Nafis Ahmed, *op. cit.*, p. 298.

৪২. *Report on the Census of Pakistan*, 1951, Vol. 3, East Bengal, Part-II (Tables), p. 11: 3.

৪৩. *Ibid*, p. 317.

৪৪. Papya Ghosh, 'The 1946 Riot and the Exodus of Bihari Muslims to Dhaka', Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, First Published, The Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, 1991, pp. 281-282.

৪৫. কাজী আনওয়ারুল হক, *তিন পতাকার তলে*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা; উদ্ধৃত, মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রিক শতবছরের রাজনীতি ও হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক*, সপ্তম মুদ্রণ, কথামেলা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৩২০।

৪৬. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, 'নগরায়ণ ও নাগরিক শ্রেণী', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১)*, তৃতীয় খণ্ড, প্রথম বাংলা সংস্করণ, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৪।

৪৭. *ঐ*, পৃ. ২০৫।

৪৮. এমাজউদ্দীন আহমদ, 'পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ', আহমদ, এমাজউদ্দীন ও হারুন-অর-রশিদ সম্পাদিত, *রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি*, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৩, প্রথম প্রকাশ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৮০।

৪৯. Brinda Bose, 'Modernity, Globality, Sexuality and the city: A Reading of Indian Cinema', *Journal of the Global South*, Vol. 2, No. 1, Spring 2008, p. 40.

৫০. Lambert van der Laan, 'Changing Urban Systems: An Empirical Analysis at two spatial levels', *Journal of the Regional Studies*, Vol. 32, N. 3, April, 1998, p. 245.

৫১. Nafis Ahmed, *op. cit.*, p. 321.

৫২. Cited in *Bangladesh District Gazetteers: Rajshahi*, 1976, p. 149.

৫৩. অশোক মিত্র, *তিন কুড়ি দশ (প্রথম চব্বিশ বছর ১৯১৭-১৯৪০)*, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ৪৯।

৫৪. *Bangladesh District Gazetteers: Faridpur*, 1979, p. 157.

৫৫. *Eastern Bengal District Gazetteers: Chittagong*, Calcutta, 1908, p. 113.

৫৬. ১৮৪০ সালে Mr. Sconce নামক ইংরেজ কালেক্টর আসাম এবং কলকাতার বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে কিছু চিনা চা চারাগাছ এনে চট্টগ্রামকে চা শিল্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। Mr. Hogue প্রথম চা শিল্প গড়ে তোলেন এবং ১৮৪৩ সালে এটি শিল্পপণ্যে পরিণত হয়। ক্রমেই এ শিল্পে উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং চা উৎপাদনও বেড়ে চলে। *Ibid*, pp. 115-118.

৫৭. *Ibid*, p. 122.

৫৮. রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা (১৬১০-১৯৪৭)*, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৩২।

৫৯. আবু জাফর শামসুদ্দীন, *আত্মস্মৃতি*, অখণ্ড সংস্করণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড একত্রে), সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৭৩।

৬০. ড. রংগলাল সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

৬১. *ঐ*, পৃ. ৭২-৭৪।